

শিশু কেন স্কুলে যেতে চায় না

সঠিক তারিখ মনে পড়ছে না, তবে কোন এক রবিবার সকালে খবরের কাগজ পড়ছিলাম। হঠাৎ টেলিফোনের আওয়াজ। আমার ছেলে সাধারণত আমেরিকা থেকে এ সময় ফোন করে। তাড়াতাড়ি ফোন ধরলাম। কিন্তু ওপাশ থেকে ভেসে এলো এক নারী কণ্ঠ—আমার এক আত্মীয়। কুশল জিজ্ঞাসা না করেই বলতে শুরু করল, “আমাকে সাহায্য কর, আমি আর পারছি না।” বুঝতে পারছিলাম সে কোনকিছু নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন। বললাম, “কি হয়েছে না জেনে আমি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করব?” এক নিঃশ্বাসে যে কথাগুলো সে আমাকে জানাল তা হলো, তার এগারো বছরের ছেলে দু’সপ্তাহ আগে হঠাৎ তাকে জানাল সে আর স্কুলে যাবে না। এর কিছুদিন আগে থেকেই নানা শারীরিক অসুস্থতা যেমন মাথাব্যথা, পেটব্যথা, বুকব্যথা ইত্যাদি অজুহাতের মাধ্যমে স্কুলে না যাওয়ার চেষ্টা করত অথবা গেলেও অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসত। জোর করে স্কুলে পাঠালে সে ঘ্যানঘ্যান করত, মেজাজ খারাপ করত অথবা কান্নাকাটি করত। এখন বোঝানোর চেষ্টা করে, প্রলোভন দেখিয়ে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে, এমনকি মারধর করেও ছেলেকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। স্কুলে পাঠাবার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বুঝতে পারলাম ছেলের স্কুলে যাওয়ার অসম্মতি আমার আত্মীয়টিকে অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। কিছু কিছু অভিভাবককে নিশ্চয়ই এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। স্কুলে যাওয়ার অসম্মতি কি এবং এর বৈশিষ্ট্যাবলীই বা কি? কেন কোন কোন শিশু স্কুলে যেতে চায় না? এ সমস্যা দেখা গেলে কি করা উচিত

ড. রোকেয়া আহমেদ

ইত্যাদি নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। স্কুলে যাওয়ার অসম্মতি বা স্কুল বর্জন শিশুদের এক প্রকার আচরণ সমস্যা। ছুর যেমন কোন শারীরিক অসুবিধার লক্ষণ হিসাবে দেখা যায়, ঠিক তেমনই স্কুলে যাওয়ার অসম্মতি হলো শিশুর অথবা তার পরিবারের কোন মানসিক সমস্যার বহিঃপ্রকাশ। সাধারণত বিচ্ছেদ উদ্বেগকে এর প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে। যে সমস্ত ছেলেমেয়ে তাদের বাবা-মাকে ছেড়ে স্কুলে যেতে চায় না এবং মা-বাবাও তাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য তেমন জোর করেন না, উপরন্তু নিজেরাও বিচ্ছেদ উদ্বেগে ভোগেন—সেই সমস্ত মা-বাবার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ সমস্যা বেশি দেখা যায়। এরা যে স্কুল অপছন্দ করে, স্কুলভীতিতে আক্রান্ত অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে স্কুল পলায়ন করে তা নয় এবং বাড়িতে থাকার চেয়ে স্কুলে যাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচন করে না; বরং স্কুলে যাওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে আবেগজনিত সমস্যা জড়িত থাকার কারণে তারা স্কুলে যেতে চায় না। এসব ছেলেমেয়ের মধ্যে অতিরিক্ত উদ্বেগ ছাড়াও কান্নাকাটি, ঘুমের সমস্যা, অপরাধবোধ, দুঃখ, আশাহীনতা, ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষণ্ণতার লক্ষণগুলো অধিক পরিমাণে দেখা যায়। স্কুলজীবনের যে কোন সময় যে কোন লিঙ্গ এবং যে কোন সামাজিক অবস্থানের শিশুদের এই সমস্যা দেখা দিতে পারে। সাধারণত ৫ থেকে ৭ বছর বয়সে অথবা স্কুল শুরু করার সময় এবং ১১ বছর অথবা যৌবন প্রাপ্তির প্রথম দিকে এই সমস্যা বেশি হয়। কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই সমস্যা তীব্র এবং ক্ষণস্থায়ী থাকে; আবার কারও কারও ক্ষেত্রে কয়েকদিন, এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। স্কুলের পড়াশোনা বুঝতে না পারা অথবা বাড়ির কাজ ঠিকমতো করতে না পারা এই সমস্যার সৃষ্টি করে না। এই ধরনের ছেলেমেয়ে সাধারণত মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এবং এদের একাডেমিক ক্ষমতাও মাঝারি ধরনের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতার অভাব, সঙ্গী-সাবানদের সঙ্গে সঠিকভাবে মেলামেশা না করতে পারা, সামাজিক একাকিত্ব ইত্যাদি সঙ্গীতগুলো ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। প্রকৃত শান্ত ও শিষ্টি থাকার কারণে এই



সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুকে স্কুলে যাওয়ার জন্য উৎসাহী করে তোলা যায়

ছেলেমেয়ে অল্পচাপমূলক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্কুলে যেতে অসম্মত শিশুদের পূর্ব জীবনতথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রাথমিক স্কুল পর্যায়েও মাকে ছেড়ে স্কুলে যেতে এদের অসুবিধা হয়েছিল। নানা কারণে এদের মায়েরা উদ্বিগ্নতা ও বিষণ্ণতায় ভোগেন এবং তাঁদের সন্তানরা কোন চাপ সহ্য করতে পারবে না বলে তাদের আগলে রাখেন। পরিবারের আকার এই সমস্যা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না, তবে জনসংক্রমের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পরিবারের বড় অথবা সবচেয়ে ছোট সন্তানের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। অনেক সময় বাড়ি ও স্কুলে চাপমূলক ঘটনার উপস্থিতি যেমন স্কুল পরিবর্তন, শিক্ষক পরিবর্তন, শারীরিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, হাসপাতালে অবস্থান, মৃত্যু, মা-বাবার বিচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, সঙ্গী-সাবানদের অত্যাচার, কঠোর শিক্ষক ইত্যাদি স্কুল প্রত্যাহান বা বর্জনের পূর্ববর্তী কারণ হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারে। বিভিন্ন চাপমূলক ঘটনা একত্রে মোকাবিলা করতে হলেও স্কুলে যাওয়ায় অসম্মতি দেখা যায়। অনেকদিন স্কুল বন্ধ থাকার কারণে স্কুলে না যাওয়ার অভ্যাস থেকে এ ধরনের সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে অসম্মতি—এই সমস্যাটি যে কেবল তাদের মা-বাবাকে ভাবিয়ে তোলে তাই নয়, এর কারণে ছেলেমেয়েরা সামাজিক এবং একাডেমিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে থেকে বঞ্চিত হয়। সুতরাং এই সমস্যা দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাভিত্তিক ছেলেমেয়েকে কিভাবে পুনরায় স্কুলে ফিরিয়ে আনা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। সমস্যার প্রকৃতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার জন্য শিশু ও পরিবেশ (যেমন-পরিবার, বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের সঙ্গী-সাবান ইত্যাদি) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন (Herbert, 1987, 98, King et al., 1995)। অভিভাবক, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী, শ্রেণীশিক্ষক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রভৃতি ব্যক্তির কাছ থেকে শিশু সম্পর্কে নানা তথ্য জেনে সমস্যার প্রকৃতি নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার মনোচিকিৎসা পদ্ধতি এবং কাউন্সিলিং প্রয়োগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য শিশুর

শিথিলতা প্রশিক্ষণ (Relaxation Training), সুনিয়ন্ত্রিত সংবেদ হ্রাসকরণ (Systematic Desensitization), অবস্থিতিমূলক পুনর্গঠন (Cognitive Restructuring) ইত্যাদি মনোচিকিৎসা স্কুলে যেতে অসম্মত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত না ভীত শিশু ভীতিপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে (এ ক্ষেত্রে স্কুলে যাওয়া) অভ্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ভীতিপূর্ণ অবস্থার সঙ্গে পরিচিত করানো (Marks, 1975)। স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে অবস্থান করে অনেক শিশু মা-বাবার কাছ থেকে অতিরিক্ত মনোযোগ পায়। এই অতিরিক্ত মনোযোগ স্কুলে না যাওয়ার বলবৃদ্ধি (Reinforcement) হিসাবে কাজ করে। তাই শিশুকে তাড়াতাড়ি স্কুলে পাঠাবার জন্য বাড়িতে অবস্থান করার পরিবর্তে স্কুলে গেলে তাকে বলবৃদ্ধি দেয়া প্রয়োজন। স্কুলের পড়াশোনা এবং অন্যান্য কাজ স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসে করলে পড়াশোনার অগ্রগতি হলেও স্কুলে যাওয়ার আকর্ষণ কমে যায়। কখনও কখনও শিশুকে স্কুলে পুনরায় পাঠাতে দেহি হলে, অন্যান্য ছেলেমেয়েকে নিয়ে একসঙ্গে স্কুলের কাজ করানো যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশিদিন চালু না রাখাই ভাল। স্কুলে যেতে অসম্মত শিশুটি যদি বাড়িতে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে, যদি মা-বাবা তাকে সঠিকভাবে পরিচালন করতে ব্যর্থ হন অথবা ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করে সঠিকভাবে কাজ না হয় তখন তাকে সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিন ভাগের দু’ভাগ শিশুকে সম্পূর্ণভাবে স্কুলে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। শিশুর বয়স কম হলে, লক্ষণের তীব্রতা বেশি না হলে এবং তাড়াতাড়ি চিকিৎসা শুরু করলে ভাল ফলাফল আশা করা যায়। কোন কোন শিশু স্কুলে ফিরে গেলেও তার মধ্যে নানা প্রকার আবেগীয় সমস্যা অনেকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শিশুর মধ্যে নানা প্রকার নিউরোটিক বৈকল্য থাকে। স্কুলসংক্রান্ত যে কোন অসুবিধা দূর করার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া অত্যন্ত জরুরী। এ ব্যাপারে

অভিভাবক এবং স্কুল কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের উভয়ের সহযোগিতামূলক মনোভাবের ওপর মনোচিকিৎসার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। স্কুলে যাওয়ার অসম্মতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকরা যদি দৃঢ়ভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করেন এবং স্কুলের শিক্ষকরা যদি এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেন তাহলে কিছুদিনের মধ্যে শিশুকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব। বিভিন্ন গবেষণা (Last et al., 1987) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে সমস্ত ছেলেমেয়ে স্কুলে যেতে অসম্মত জানায় তাদের মা-বাবার মধ্যে নানা প্রকার মানসিক সমস্যা থাকে। এই ধরনের মা-বাবাকে আচরণগত পারিবারিক চিকিৎসা এবং নানা প্রকার কাউন্সিলিং প্রয়োগ করে তাদের সমস্যা কমানো যায়। তা ছাড়া শিশুদের পরিচালন করার জন্য অভিভাবকরা কিংবদন্তি গ্রহণ করবেন সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য পারিবারিক চিকিৎসা পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। অনেক সময় নানা শারীরিক অসুস্থতার ভান করে শিশুরা স্কুলে যাওয়া বর্জন করে। আবার অনেক সময় নানা সংক্রামক ব্যাধি এবং প্রকৃত শারীরিক অসুস্থতা স্কুল বর্জনের কারণ হতে পারে। তাই একজন ভাল ডাক্তারের সাহায্যে শিশুকে পরীক্ষা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। শিশুর শিক্ষাগত এবং আচরণগত তথ্য জানার জন্য স্কুলের শিক্ষক, বিশেষ করে শ্রেণীশিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকরা আলোচনা করে ঠিক করবেন শিশুকে বিশেষ কোন সাহায্য প্রদান করা প্রয়োজন কিনা অথবা বর্তমান স্কুল পরিবর্তন করে নতুন কোন স্কুলে ভর্তি করতে হবে কিনা। কোন কোন অভিভাবক মনে করেন, স্কুল পরিবর্তন করলেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। স্কুলসংক্রান্ত কোন ঘটনার জন্য যদি শিশু স্কুলে যেতে অস্বীকার করে, তাহলে এ ব্যবস্থায় ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। তবে সমস্যা যদি শিশুর নিজের মধ্যে থাকে তাহলে স্কুল পরিবর্তন করে কোন লাভ হবে না।